ভ্লাদিমির সুতেয়েভ

গল্প আর ছবি

ভ্লাদিমির সুতেয়েভ · গল্প আর ছবি

লেখা ও আঁকা:
ভ্লাদিমির সুতেয়েভ

মুরগীছানা হাঁসের ছানা

ডিম ফুটে বেরুল হাঁসের ছানা।
বললে, 'বেরিয়ে এসেছি।'

'আমিও,' বললে মুরগীছানা।

‘চললাম বেড়াতে,’ বললে হাঁসের ছানা।
‘আমিও,’ বললে মুরগীছানা।
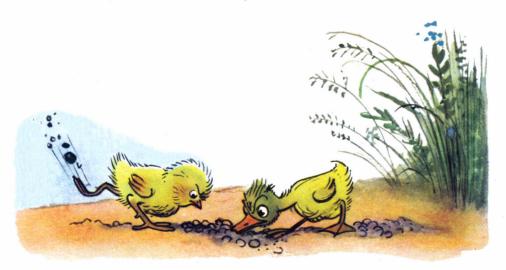
‘গর্ত খুঁড়ছি,’ বললে হাঁসের ছানা।
‘আমিও,’ বললে মুরগীছানা।

‘পোকা পেয়েছি রে,’ বললে হাঁসের ছানা।
‘আমিও,’ বললে মুরগীছানা।

‘ফড়িং ধরেছি,’ বললে হাঁসের ছানা।
‘আমিও,’ বললে মুরগীছানা।

‘একটু সাঁতার দিই গে,’ বললে হাঁসের ছানা।
‘আমিও,’ বললে মুরগীছানা।

‘চললাম সাঁতরে,’ বললে হাঁসের ছানা।

'আমিও,' চেঁচালে মুরগীছানা।

'বাঁচাও! বাঁচাও!'

মুরগীছানাকে টেনে তুলল হাঁসের ছানা।

'ফের চললাম জলে,' বললে হাঁসের ছানা।
'আমি বাপু যাচ্ছি নে,' বললে মুরগীছানা।

৩ হাতী
সোভিয়েত ইউনিয়ন
ভস্তক

তিন
বেড়াল

তিনটে বেড়ালছানা: কালো, ছেয়ে, শাদা...

চোখে পড়ল ইঁদুর...

... ছুটল ইঁদুরের পেছনে।

ময়দার বয়ামে লাফিয়ে পড়ল ইঁদুর।

তার পেছু পেছু বেড়ালেরা। ইঁদুর পালাল।
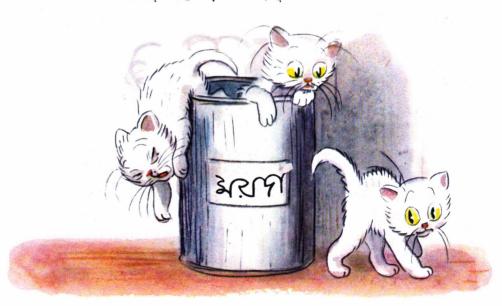
আর বয়াম থেকে বেরিয়ে এল তিনটে শাদা বেড়াল।

উঠোনে দেখে ব্যাঙ, তিন শাদা বেড়াল ছুটল তার পেছন।

ব্যাঙ লুকিয়ে পড়ল পুরনো এক সামোভারের নলে। বেড়ালেরাও ঠিক পেছন পেছন।

ব্যাঙ পালাল লাফিয়ে...

...আর নল থেকে বেরিয়ে এল তিনটে কালো বেড়াল।

তিনটে কালো বেড়াল পুকুরে দেখে মাছ...

...ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারে।

মাছ গেল পালিয়ে...

...জল থেকে উঠল তিনটে ভেজা বেড়াল।

তিনটে ভেজা বেড়াল ফিরল বাড়িতে।

পথে যেতে যেতে গা শুকিয়ে ঠিক যেমন ছিল তেমনি: কালো, ছেয়ে আর শাদা।

ব্যাঙের ছাতা

ভারি বৃষ্টি নামল একবার।

কোথায় লুকোয় পিঁপড়ে?

দেখে, মাঠের মধ্যে এক ছোট্ট ব্যাঙের ছাতা, ছুটে গিয়ে লুকোল তার তলে।

বসে আছে ছাতার নিচে, কখন বৃষ্টি থামে।

বৃষ্টি কিন্তু থামে না…

ছাতার কাছে আসে এক ভেজা প্রজাপতি:

'পিঁপড়ে, ও পিঁপড়ে, ছাতার নিচে ঠাঁই দে একটু। ভিজে গেছি, উড়তে পারছি না।'
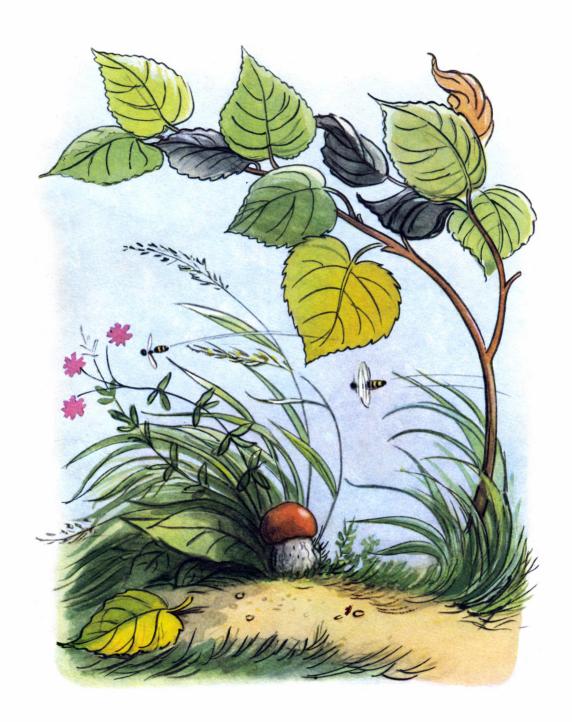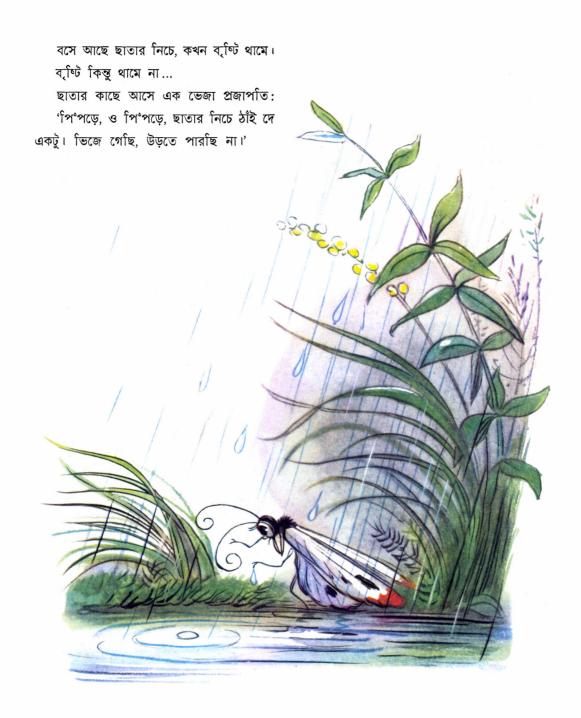
পিঁপড়ে বলে, 'ঠাঁই কোথায়? আমি একাই বলে কোনো রকমে মাথা গুঁজেছি।'
'ভাবিস না কিছু! নয় ঘেঁষাঘেঁষি হোক, রেষারেষি নয়।'
প্রজাপতিকে ঠাঁই দিল পিঁপড়ে।

বৃষ্টি ওদিকে আরো জোরে...

ছুটে যাচ্ছিল ইঁদুর:

‘ছাতার তলে ঠাঁই দে না একটু। গা দিয়ে নদী বইছে।’

‘কোথায় ঢুকবি বল, ঠাঁই নেই।’

‘একটু নয় ঘেঁষাঘেঁষিই হবে।’
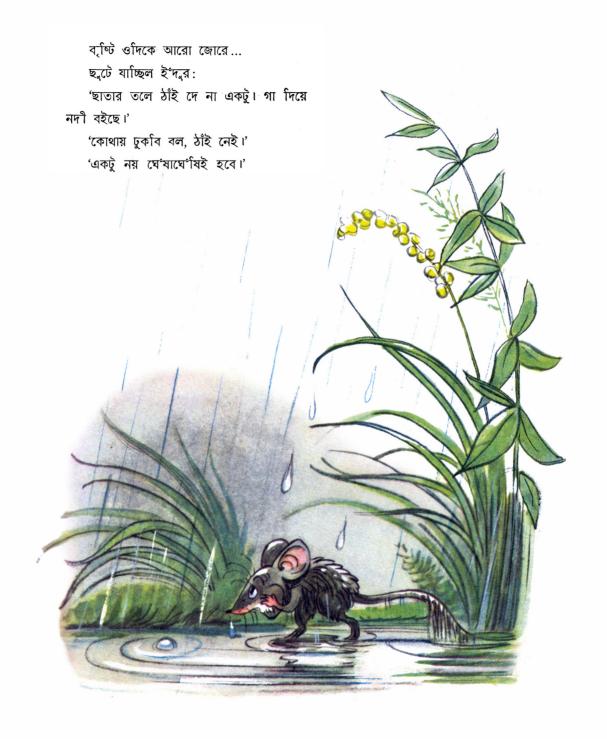
ঘেঁষাঘেঁষি করে ঠাঁই দিলে ইঁদুরকে।
বৃষ্টির ওদিকে থামার নাম নেই ...

ছাতার কাছে কেঁদে কেঁদে লাফিয়ে বেড়ায় চড়ুই:

'জলে ভিজে ভারি কাবু, ডানা দুটি জবুথবু। ছাতার নিচে ঠাঁই দে, শুকিয়ে নিই, জিরিয়ে নিই, বৃষ্টিটা থামুক।'

'ঠাঁই নেই বাপু।'

'একটু সরে দাঁড়াও না ভাই।'

'নাও বাপু, তাই এসো।'

সরে সরে দাঁড়াল, ঠাঁই হল চড়ুইয়ের।

এমন সময় লাফিয়ে আসে খরগোস, দেখে ব্যাঙের ছাতা।

বলে, 'লুকিয়ে রাখো আমায়, বাঁচাও! পেছনে শেয়াল তাড়া করেছে!..'

পিঁপড়ে বলে, 'সত্যি বেচারি, নে একটু সরে টরে ঠাঁই করে দিই।'
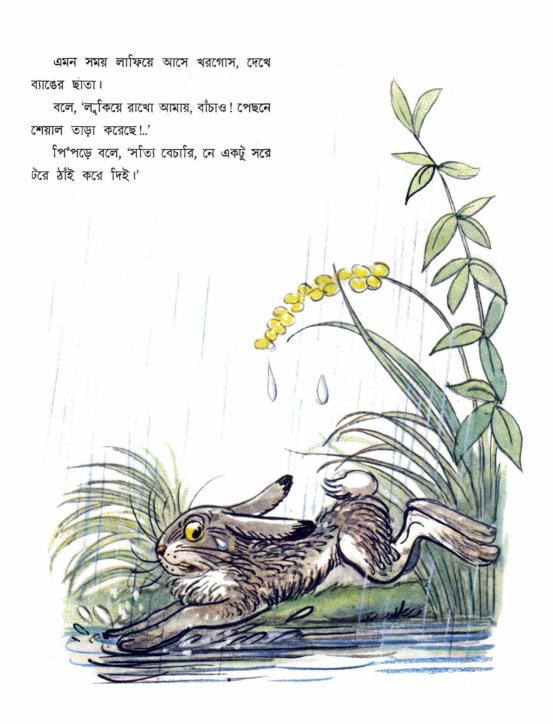
খরগোস লুকতেই ছুটে এল শেয়াল।
বলে, 'খরগোস দেখিস নি একটা?'
'না তো।'

কাছে সরে এল শেয়াল, শুঁকে শুঁকে বলে:
‘এখানে লুকিয়ে নেই তো?’
‘এখানে? লুকিয়ে থাকার জায়গা কোথায়?’
কি আর করে, লেজ দুলিয়ে চলে গেল শেয়াল।

ততক্ষণে বৃষ্টি গেল কেটে, রোদ উঠল ফুটে।
আনন্দ করে ছাতার তল থেকে বেরিয়ে এল সবাই।

ভেবে ভেবে বললে পিঁপড়ে:
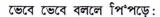
‘কি ব্যাপার বলো দেখি? ছাতার তলে একা আমারই কুলোচ্ছিল না, আর এখন দেখো পাঁচ জনের ঠাঁই হয়ে গেল!’

‘ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ! হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ!’ কে যেন হেসে উঠল।

সবাই তাকিয়ে দেখে ছাতার ওপরে বসে আছে ব্যাঙ, হাসছে:

‘আরে, তাও জানো না, ব্যাঙের ছাতা যে...’

সবটা না বলেই লাফিয়ে পালাল সে।

সবাই তখন ব্যাঙের ছাতার দিকে তাকিয়ে দেখলে, দেখেই বুঝল কেন প্রথমে একজনেরও কুলোয় নি, পরের দিকে পাঁচ জনেরই ঠাঁই হয়ে গেল।

বুঝেছ তোমরা কেন?

ম্যাও
করলে
কে?
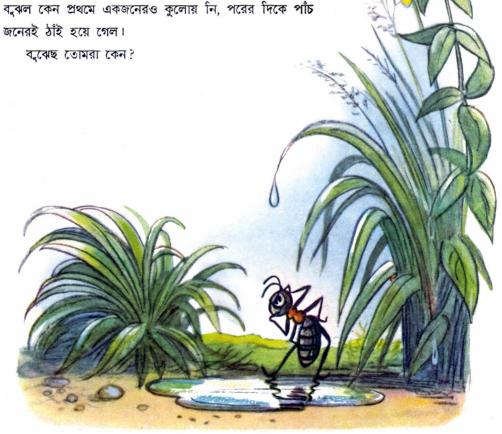
সোফার কাছে গালিচার ওপর ঘুমিয়েছিল কুকুরছানা।
হঠাৎ ঘুমের মধ্যে কানে এল কে যেন বললে:
‘ম্যাও!’
মাথা তুললে কুকুরছানা, তাকিয়ে দেখলে কেউ নেই।

বোধ হয় স্বপ্ন, এই ভেবে আরো আয়েস করে গা এলাল।

অমনি ফের কে যেন বললে:
‘ম্যাও!’
‘কে রে?’

লাফিয়ে উঠল কুকুরছানা, ছুটে বেড়াল সারা ঘর, উঁকি দিলে খাটের নিচে, টেবলের নিচে — কেউ নেই!

উঠে পড়ল জানলায়, দেখে জানলার ওপারে আঙিনায় বেড়াচ্ছে মোরগ।

মোরগটাই তাহলে ঘুমতে দিচ্ছে না আমায়, এই ভেবে সে ছুটে গেল মোরগটার দিকে।
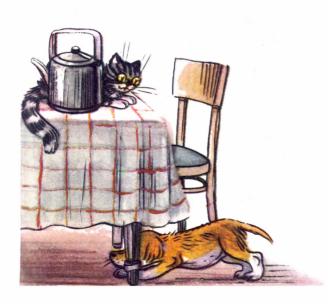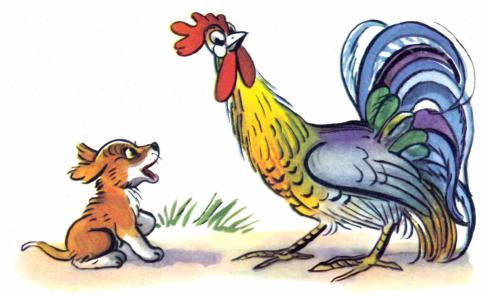
‘‘ম্যাও’ করছিলি তুই?’ মোরগকে শুধাল কুকুরছানা।

‘না তো, আমার ডাক তো যে...’ এই বলে ডানা দুলিয়ে ডেকে উঠল মোরগ: **‘কোঁকর-কোঁ-কোঁ!’**

‘আর কিছু বলতে পারিস না তুই?’

‘উহুঁ, কেবল কোঁকর-কোঁ,’ বললে মোরগ।
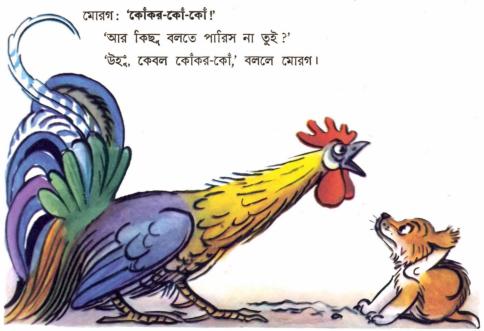
পেছনের পা দিয়ে কান চুলকিয়ে বাড়ি ফিরল কুকুরছানা...

ঠিক দাওয়ার কাছেই কে যেন বললে:

'ম্যাও!'

'এইখানেই আছে তাহলে,' এই বলে চটপট চার থাবায় খুঁড়তে লাগল দাওয়া।

মস্ত এক গর্ত খুঁড়তেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল ছেয়ে রঙের ছোট্ট এক ইঁদুরছানা।

‘তুই বললি ‘ম্যাও’?’ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলে কুকুরছানা।
‘চিঁ-চিঁ-চিঁ,’ চিঁচিঁ করলে ইঁদুর, ‘কে আবার কী বললে?’

‘কে যেন বললে ‘ম্যাও’...’
‘কাছাকাছি?’
‘এই এখানেই, কাছেই,’ বললে কুকুরছানা।

‘ওরে বাবা, ভয় করছে, **চিঁ-চিঁ-চিঁ!’** দাওয়ার ফাটলে সেঁধিয়ে গেল ইঁদুরছানা।
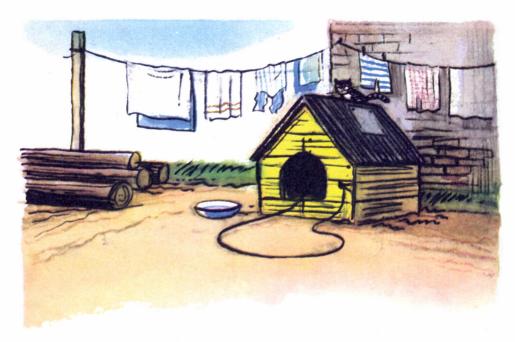
ব্যাপারটা কী ভাবতে বসল কুকুরছানা।

হঠাৎ যেন কুকুর ঘরের কাছে জোর গলায় কে যেন বললে:

'ম্যাও!'

তিনবার ঘরখানা পাক দিলে কুকুরছানা, কিন্তু কাকেও দেখল না। শুধু ঘরের ভেতর কে যেন নড়ছে...

ওই তাহলে! ভাবলে কুকুরছানা, এই বার ধরব... এগিয়ে গিয়ে ওঁৎ পেতে রইল সে...
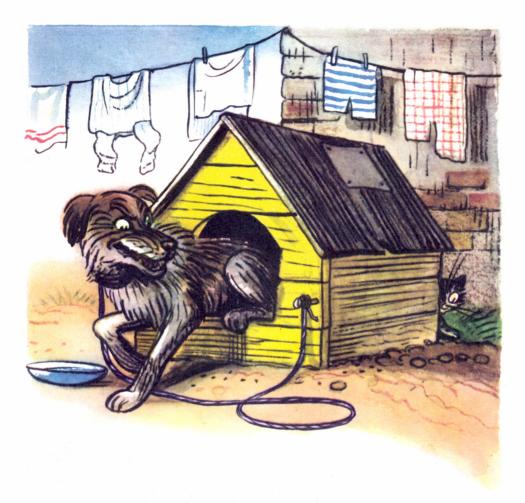
লাফিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝাঁকড়া লোমো কেঁদো কুকুর।

‘গর-র্-র্-র্!’ গর্জন করলে কুকুর।

‘আমি... মানে, আমি শুধু জানতে চাইছিলাম...’

‘গর-র্-র্-র্!’

‘তুমিই... ‘ম্যাও’ করছিলে?’ লেজ গুটিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে ছানা।

‘আমি?! আমার সঙ্গে ঠাট্টা!’

চার ঠ্যাং তুলে কুকুরছানা একেবারে বাগানের ভেতরে লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে। আর ঠিক যেন তার কানের কাছে কে বললে:

'ম্যাও!'

ঝোপ থেকে মাথা তুলল ছানা। ঠিক তার সামনেই ফুলের ওপর বসে আছে মখমলী এক মৌমাছি।

এই তাহলে 'ম্যাও' করেছে, এই ভেবে দাঁতে কামড়ে ধরতে গেল তাকে।

'বোঁ-বোঁ-বোঁ!' রেগে বোঁবোঁ করে উঠল মৌমাছি, ভালো করে হুল ফুটিয়ে দিলে কুকুরছানার নাকে।

ককিয়ে উঠে ছুটল কুকুরছানা, মৌমাছিও তার পেছন পেছন।

ওড়ে আর বোঁবোঁ করে:

'বোঁ-বোঁ-বোঁ, হুল ফুটাবো! বোঁ-বোঁ-বোঁ, হুল ফুটাবো!'

পুকুরে ছুটে গেল কুকুরছানা, একেবারে জলের মধ্যে!

জল ছেড়ে উঠে দেখে মৌমাছি আর নেই।
অথচ ফের কে যেন ডেকে উঠল:
'ম্যাও!'
'তুই বললি 'ম্যাও'?' কাছেই সাঁতার দিচ্ছিল একটা মাছ, তাকেই জিজ্ঞেস করলে ছানা।
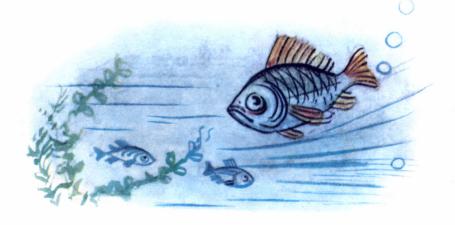
মাছ কিন্তু জবাব দিলে না, লেজের ঝাপট মেরে তলিয়ে গেল গভীরে।

'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ!' হোহো করে হেসে উঠল ব্যাঙ, শালুকের ওপর বসে ছিল সে, 'মাছেরা যে কথা বলে না, তাও জানিস না তুই?'

'তাহলে তুই বললি 'ম্যাও'?' ব্যাঙকে জিজ্ঞেস করলে ছানা।

'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ!' ফের হাসলে ব্যাঙ, 'কী বোকা রে তুই! ব্যাঙ তো শুধু ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে।'

বলেই লাফ দিল জলে।

ঘরে ফিরল কুকুরছানা, সারা গা ভেজা, নাকটা ফোলা। মন ভার করে শুলে সে সোফার কাছে গালিচার ওপর। হঠাৎ শোনে:

'ম্যাও !!'

লাফিয়ে উঠল সে, জানলার ওপর বসে আছে লোমঝুমঝুম ডোরাকাটা বেড়াল।

'ম্যাও!' বললে বেড়াল।

'ঘেউ-ঘেউ!' বলে ডেকে উঠল ছানা, তারপর মনে পড়ল কীভাবে গর্জন করেছিল কেঁদো কুকুরটা। তাই গর্জন করলে, **'গর-র্-র্-র্!'**

বেড়াল পিঠ বেঁকিয়ে হিসিয়ে উঠল, **'শ্-শ্-শ্!'**

তারপর **'ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ!'** করে মুখ ভেংচিয়ে লাফিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

নিজের গালিচায় ফিরে এসে শুল কুকুরছানা।
কে বললে 'ম্যাও' সেটা এবার সে জানে।

নানা
মাপের
চাকা

গাছের এক গুঁড়ি, তার ওপর কোঠা।

তাতে থাকে মাছি, ব্যাঙ, সজারু আর হলদে ঝুঁটি মোরগটি।

একদিন তারা বনে গেল, কেউ খোঁজে ফুল, কেউ ব্যাঙের ছাতা, কেউ কাঠ-কুটো, কেউবা ফলপাকুড়।

বনে ঘুরে ঘুরে পৌঁছুল এক ফাঁকা জায়গায়। দেখে কি, একটা খালি গাড়ি। খালি বটে, মজারও বটে — চাকাগুলো তার হরেক রকম: একটা চাকা একেবারেই ছোট, পরেরটা একটু বড়ো, তার পরেরটা মাঝারি, আর সব শেষেরটা ইয়া বড়ো!

বোঝাই যায় অনেক দিন ধরে পড়েই আছে গাড়িটা, তলায় তার ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে।

মাছি, ব্যাঙ, সজারু আর মোরগটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর অবাক হয়। এমন সময় ঝোপ থেকে লাফিয়ে এল এক খরগোস। সে কিন্তু দেখে আর হাসে।

'গাড়িটা বুঝি তোমার?' তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে।

'উহুঃ, এটা ভালুকের গাড়ি। বানাতে গিয়ে খেটেছিল খুব, কিন্তু শেষ আর হল না। ফেলে পালিয়েছে, তাই পড়েই আছে।'
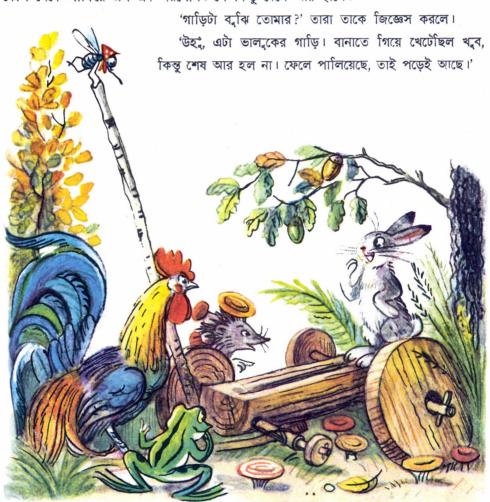
সজার্ বলল, 'চলো এটাকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাই, হয়তো কাজে লাগবে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল সবাই।

সবাই মিলে গাড়িটাকে তারা ঠেলতে লাগল, কিন্তু গাড়ি আর নড়ে না: চাকাগুলো যে সব বিদঘুটে।

ঠেলে ঠেলে হয়রান, ফল কিছু হল না। কখনো ওপাশে কাৎ হয়ে পড়ে, কখনো এপাশে উলটে আসে।

পথটাও খারাপ, কোথাও খাল, কোথাও উঁচু-নীচু।

হেসে ওঠে খরগোসটা, হেসে মরে আর কি:

'এমন গাড়ি কে বা চায়?'

হয়রান হয়ে গেল সবাই, কিন্তু ফেলে যেতে মন চায় না, সংসারের কাজে লাগবে।

সজারুটাই ফের মতলব দিলে:

'চলো, সবাই মিলে একটা করে চাকা নিয়ে যাই!'

'চলো!'

চাকাগুলো খুলে নিয়ে চলল সবাই গড়িয়ে:

মাছিটা নিল সবচেয়ে ছোটটা, সজারুটা তার চেয়ে একটু বড়ো, ব্যাঙটা নিল মাঝারিটা আর মোরগটা বসল সবচেয়ে বড়ো চাকাটার ওপর। পা দিয়ে চালায়, ডানা নেড়ে চেঁচায়:

'কোঁকর-কোঁ-কোঁ!'

খরগোসের হাসি আর ধরে না:

'মজার লোক সব! বাড়িতে নিয়ে চলল কিনা বিদঘুটে সব চাকা!'

মাছি, ব্যাঙ, সজারু আর মোরগটা ওদিকে বাড়ি নিয়ে এল চাকাগুলো, ভাবতে বসল, কী কাজে তা লাগায়।

মাছিটা বলল, 'হয়েছে!' সবচেয়ে ছোট চাকাটা দিয়ে সে বানাল একটা তকলি।

সজারুটা তার চাকায় দুটো কাঠি গাঁথল, আর সেটা হয়ে গেল একটা ঠেলা-গাড়ি।

ব্যাঙটা বলল, 'আমার মাথাতেও একটা মতলব এসেছে!' মাঝারি চাকাটাকে সে পাতকুয়োতে লাগিয়ে দিল, জল তুলতে ভারি সুবিধা।
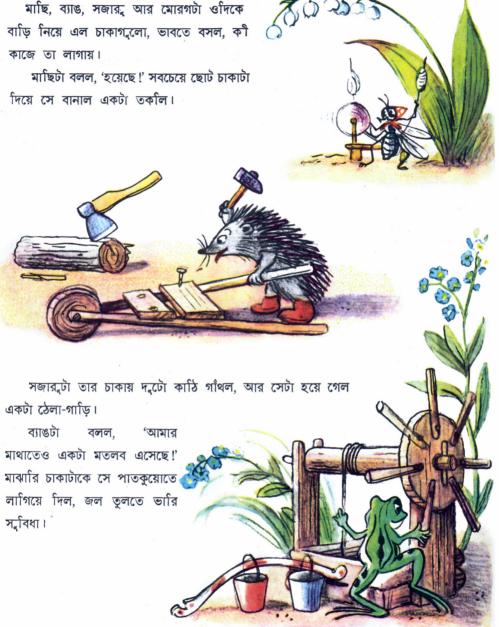
মোরগ কিন্তু সবচেয়ে বড়ো চাকাটাকে নদীর ভেতর ফিট করে বানাল একটা জল-কল।

সব চাকাগুলোই লাগল কাজে: মাছি তার তকলি দিয়ে সুতো কাটে; ব্যাঙ জল তোলে কুয়ো থেকে, বাগানে জল দেয়; সজারু তার ঠেলায় করে বন থেকে বয়ে আনে ব্যাঙের ছাতা, ফলমূল, কাঠ-কুটো।

আর মোরগ ময়দা বানায় তার কলে।

একদিন খরগোস এল বেড়াতে।
আদর করে অতিথি বরণ করলে তারা:
মাছি তাকে দস্তানা বুনে দিল,
ব্যাঙ তার বাগান থেকে গাজর আনল,
সজারু দিল ব্যাঙের ছাতা, ফলমূল,
আর মোরগ দিল মিঠে রুটি আর নরম পিঠে।

লজ্জা হল খরগোসের।

বলে, ‘মাপ করো ভাই। তখন হেসেছিলাম। এখন দেখছি কাজ জানলে বিদঘুটে চাকাও কাজে লাগে।’

নৌকা
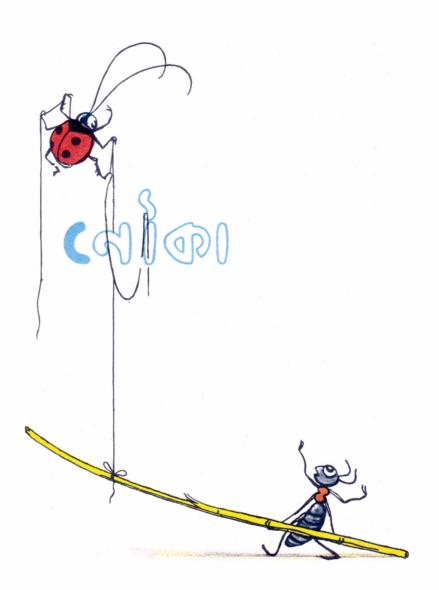
বেড়াতে বেরল ব্যাঙ, মুরগীছানা, ইঁদুর, পিঁপড়ে আর একটা গুবরে পোকা। এসে পৌঁছুল নদীর ধারে।

'চান করা যাক!' বলে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিল ব্যাঙ।

মুরগীছানা, ইঁদুর, পিঁপড়ে আর গুবরে পোকাটা চেঁচিয়ে উঠল, ‘কিন্তু আমরা তো সাঁতার দিতে জানি না।’

‘ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ!’ হাসতে লাগল ব্যাঙটা, ‘কী-ই বা তাহলে পারো?’ হাসতে হাসতে পেট বুঝি ফাটে।

মুরগীছানা, ইঁদুর, পিঁপড়ে আর গুবরে পোকার রাগ হল। ভাবতে বসল তারা। ভেবে ভেবে মতলব বেরল।

মুরগীছানাটা গিয়ে নিয়ে এল একটা পাতা।

ইঁদুর আনল আখরোটের আধখানা খোলা।

পিঁপড়ে আনল খড়।

আর গুবরে পোকাটা আনল লম্বা একটা দড়ি।

তারপর সবাই লাগল কাজে। খড়টাকে তারা আখরোট খোলার তলায় আট্‌কাল, আর দড়ি দিয়ে পাতাটাকে বাঁধল তার সঙ্গে, হয়ে গেল এক পাল-তোলা নৌকা।

জলে ভাসাল নৌকা।

চলল সবাই ভেসে।

জল থেকে মাথা তুলে ব্যাঙটা ভেবেছিল হাসবে। নৌকাটা কিন্তু তখন অনেক দূরে ভেসে গেছে... নাগাল ধরবে কে!

বিপদ
তারণ
পাঁচন
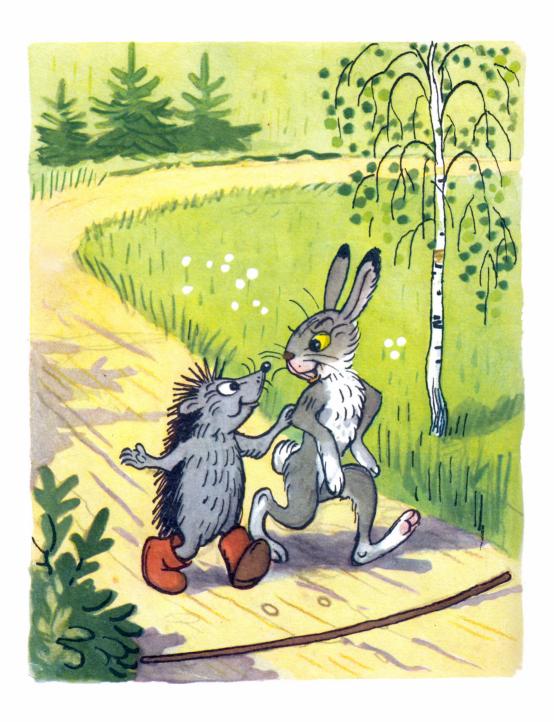
বাড়ি যাচ্ছিল সজারু। পথে সঙ্গ ধরল খরগোস, চলল তারা দুজনে মিলে। দুজনে পথ পাড়ি, অনেক তাড়াতাড়ি।

বাড়ি তো কাছে নয়, যায়, যেতে যেতে গল্প করে।

পথে পড়েছিল একটা লাঠি।

গল্প করছে খরগোস, নজর করে নি, হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে আর কি।

'বটে!' রেগে উঠল খরগোস, লাথি মারলে লাঠিতে, দূরে গিয়ে পড়ল লাঠিটা।

সজারু কিন্তু কুড়িয়ে নিলে লাঠিটা। কাঁধে তুলে চলে গেল খরগোসের সঙ্গ ধরতে।

খরগোস দেখে সজারুর কাঁধে লাঠি। অবাক হয়ে বলে:

'লাঠিটা নিয়ে কী হবে তোর, কী বা লাভ?'

'এ লাঠি সাধারণ নয়,' বললে সজারু, 'এ হল বিপদ তারণ পাঁচন।'

জবাবে কেবল ফ্যাঁচ করলে খরগোস।

যেতে যেতে সামনে পড়ল নদী।

এক লাফে নদী পেরিয়ে গেল খরগোস, অপর পার থেকে চেঁচিয়ে বললে: 'এই কাঁটা-মাথা, লাঠিটা ফেলে দে, লাঠি ঘাড়ে করে পার হতে পারবি না!'
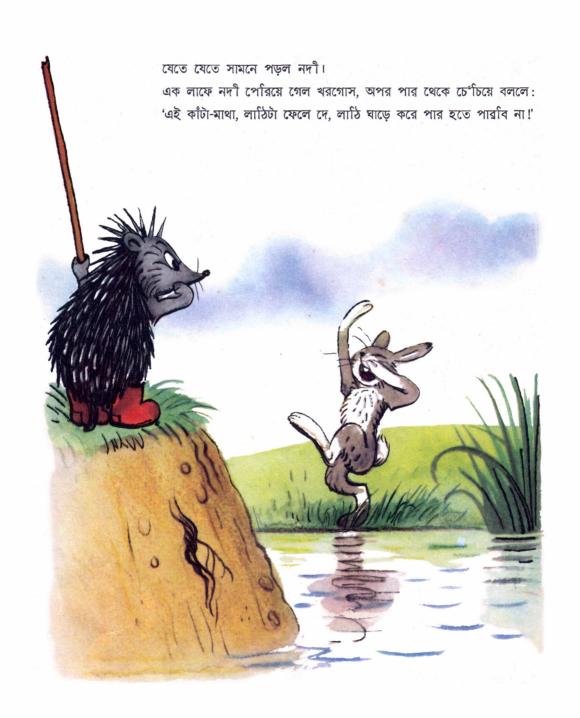
কিছু বললে না সজারু। একটু পেছিয়ে গেল সে, তারপর ছুটে এসে নদীর মাঝখানে লাঠি গেঁথে তার ওপর ভর দিয়ে এক লাফে পেরিয়ে গেল অপর পারে, দাঁড়াল গিয়ে খরগোসের পাশেই, যেন কিছুই হয় নি।

দেখে হাঁ হয়ে গেল খরগোস:

'দেখছি তুই লাফ মারতে পারিস খাসা!'

সজারু বললে, 'লাফাতে আমি মোটেই পারি না। আমায় সাহায্য করলে ওই বিপদ তারণ পাঁচন, লাঠির ভরে বাঁচন।'

চলল আরো এগিয়ে। যেতে যেতে পৌঁছল এক চোরাবালিতে।

খরগোস লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। সজারু পেছু পেছু আসে, লাঠি দিয়ে মাটি পরখ করে দেখে।

‘এ্যহ্ কাঁটা-মাথা কোথাকার, অমন কুঁথে কুঁথে আসছিস কেন? বোধ হয় তোর ওই লাঠিটা...’

কথাটা শেষও হল না, লাফ দিতেই চোরাবালিতে ডুবে গেল একেবারে কান পর্যন্ত। এই বুঝি সে খাবি খেয়ে তলিয়ে যায়।

খরগোসের কাছে একটা ঢিবিতে এসে সজারু বললে:

'নে, লাঠিটা ধর বেশ শক্ত করে!'

লাঠি আঁকড়ে ধরল খরগোস। প্রাণপণে বন্ধুকে চোরাবালি থেকে টেনে তুলল সজারু।

শক্ত ডাঙ্গায় এসে খরগোস বললে সজারুকে:

'ধন্যি তুই সজারু, আমায় বাঁচালি।'

'কি যে বলিস, এ ওই বিপদ তারণ পাঁচন, খানাখন্দে বাঁচন।'

চলল এগিয়ে, মস্ত এক ঘন কালো বনের প্রায় মুখে এসে দেখে মাটির ওপর পাখির ছানা। বাসা থেকে পড়ে গেছে, করুণ স্বরে চিঁচিঁ করছে, মায়ে বাপে পাক দিচ্ছে কেবলি, জানে না কী উপায়।

'বাঁচাও গো, সাহায্য করো আমাদের!' কাকলী করে উঠল তারা।

বাসাটা অনেক উঁচুতে, নাগাল পাওয়া ভর। খরগোস সজারু কেউ তো আর গাছে উঠতে জানে না। অথচ বিহিত একটা করা দরকার।

ভাবল সজারু, ভেবে ভেবে উপায় করলে।

খরগোসকে হুকুম দিলে, 'গাছের দিকে মুখ করে দাঁড়া!'

গাছের দিকে মুখ করে দাঁড়াল খরগোস। সজারু লাঠির ডগায় বসালে ছানাটিকে, নিজে লাঠি নিয়ে উঠল খরগোসের কাঁধে, তারপর যতদূর পারে উঁচু করে তুলে ধরল লাঠিটা, প্রায় বাসার কাছেই পেঁাছল ডগাটা।

ছানাটা এক লাফ দিতেই একেবারে বাসার মধ্যে।

মা বাপের তখন কী আনন্দ! খরগোস আর সজারুর চারপাশে উড়ে উড়ে কিচিরমিচির করে:

'ধন্যি তোমাদের, ধন্যি তোমরা!'

আর সজারুকে বলে খরগোস:

'সাবাস তোকে সজারু, বেশ বুদ্ধি করেছিলি!'

'কী যে বলিস, এ সবই ওই বিপদ তারণ পাঁচন, গাছে তোলায় বাঁচন।'

ঢুকল বনের মধ্যে। যতই ভেতরে ঢোকে ততই বন ঘন, ততই বন আঁধার। ভয় লাগে খরগোসের। সজারু কিন্তু পরোয়া করে না, সামনে এগিয়ে চলে, লাঠি দিয়ে ডালপালা সরায়।

হঠাৎ বনের ভেতর থেকে একেবারে সামনে লাফিয়ে এল প্রকাণ্ড নেকড়ে। রাস্তা আটকে গর্জন করে উঠল:

'থাম!'

থেমে দাঁড়াল খরগোস সজারু।

ঠোঁট চেটে দাঁত শানিয়ে বললে নেকড়ে:

'তুই সজারু সারা গায়ে কাঁটা তোর, তোকে ছোঁব না, কিন্তু তুই ট্যারা-চোখো খরগোস, তোর ল্যাজা মুড়ো সবশুদ্ধ গিলব!'

ভয়ে কেঁপে উঠল খরগোস, লোম তার শাদা হয়ে উঠল, শীতকালে যেমন হয়। ছুটতেও পারে না, পা যেন গেঁথে গেছে মাটিতে। চোখ বন্ধ করে ক্ষণ গুনছে এই বুঝি নেকড়ে তাকে খেলে।

সজারু কিন্তু ঘাবড়ালে না। লাঠিটা হাঁকিয়ে যত জোরে পারে বাড়ি মারলে নেকড়ের পিঠে।

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল নেকড়ে, লাফিয়ে উঠে দে ছুট...

সেই যে ছুটল, ফিরেও আর তাকাল না।

'ধন্যি তুই সজারু, নেকড়ের হাত থেকেও তুই আমায় বাঁচালি।'

'এ ওই বিপদ তারণ পাঁচন, পিটুনি দিয়ে বাঁচন।'

চলল আরো এগিয়ে। বন উজিয়ে বেরিয়ে এল পথে। তবে পথ বড়ো দুর্গম, পাহাড় ভেঙে ওঠা।

সজারু লাঠিতে ভর দিয়ে খুটখুটিয়ে ওঠে, আর বেচারী খরগোস পিছিয়ে যায়, ক্লান্তিতে উলটে পড়ে আর কি।

বাড়ি প্রায় এসে গেছে, খরগোস কিন্তু আর চলতে পারে না।

'ভাবনা নেই,' বললে সজারু, 'আমার লাঠিটা ধর।'

লাঠি চেপে ধরলে খরগোস, সজারু তাকে টেনে তুলতে লাগল পাহাড়ে।

খরগোসের মনে হল পাহাড়ে উঠতে বেশ হালকাই লাগছে যেন।

বললে, 'দ্যাখ, তোর বিপদ তারণ পাঁচন আমায় এবারেও সাহায্য করল তাহলে।'

এমনি করেই সজারু ঘরে পেঁছে দিলে খরগোসকে। খরগোস গিন্নি আর ছানাপোনারা তারই পথ চেয়ে বসেছিল।

সবার আনন্দ আর ধরে না। সজারুকে বলে খরগোস:

'তোর এই বিপদ তারণ যাদু পাঁচন নইলে আর আমার ঘরে ফিরতে হত না।'

হেসে সজারু বললে:

'লাঠিটা তোকে উপহার দিলাম, কাজে লাগবে।'

অবাক হল খরগোস:

'এমন যাদু লাঠি ছাড়া তোর চলবে কি করে?'

'ভাবনা নেই,' বললে সজারু, 'লাঠি সব সময় মেলে, কিন্তু বিপদ তারণ — সেটা এইখানে।' এই বলে নিজের মগজটা দেখাল সজারু।

সব তখন পরিষ্কার হয়ে গেল। খরগোস বললে:

'ঠিক বলেছিস, লাঠিটা কিছু নয়, বড়ো কথা হল বুদ্ধিমন্ত মাথা আর দয়াবন্ত বুক।'

হেমন্তের শেষাশেষি। গাছ থেকে পাতা ঝরে গেছে অনেক দিন, শুধু বুনো আপেল গাছটার মাথায় ঝুলছিল একটিমাত্র আপেল।

এই সময় বনে ছুটে বেড়াচ্ছিল খরগোস। দেখে কি, আপেল।

কি করে পাড়ি? অনেক ডগায়, লাফ দিয়ে ছোঁয়া যাবে না।

'কা-কা!'

তাকিয়ে দেখে, ফার গাছের ওপর দাঁড়কাক। বসে বসে হাসছে।

খরগোস হেঁকে বললে, 'দাঁড়কাক, আপেলটা পেড়ে দে!'

উড়ে গিয়ে আপেল পাড়লে কাক, কিন্তু ঠোঁটে ধরে রাখতে পারল না, পড়ে গেল নিচে।

'ধন্যি তুই দাঁড়কাক,' এই বলে আপেল কুড়তে যাবে খরগোস। হঠাৎ জ্যান্তের মতো ফোঁস করে উঠল আপেল, ছুটে পালাল।

এ কি কাণ্ড?

ভয় পেয়ে গেল খরগোস, পরে বুঝলে: গাছের তলায় গা গুটিয়ে ঘুমিয়েছিল সজারু, আপেলটা পড়েছে তারই গায়ে। ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে ছুট দিয়েছে সজারু, আপেলটা তার কাঁটায় গাঁথা।

'দাঁড়া, দাঁড়া! আমার আপেল নিয়ে চললি কোথায়?'

সজারু থেমে বলে:

'এটা আমার আপেল, গাছ থেকে পড়েছে, আমি ধরেছি।'

সজারুর কাছে খরগোস ছুটে গিয়ে বলে:

'এখুনি দিয়ে দে আমার আপেল, ওটা আমার!'

দাঁড়কাক উড়ে এল তাদের কাছে।

বলে, 'তর্ক আবার কি, ওটা আমার, আমি ঠুকরে ফেলেছি।'

কেউ কারো মত মানে না, সবাই চেঁচায়:

'আমার! আমার!'

বন জুড়ে চেঁচামেচি। শুরু হয়ে গেল মারামারি। সজারুর নাকে ঠোকর দিলে কাক। খরগোসকে কাঁটার খোঁচা দিলে সজারু, আর দাঁড়কাককে চাঁট মারলে খরগোস...

এমন সময় দেখা দিল ভালুক। হেঁড়ে গলায় বলে:

'কি ব্যাপার, এত গোলমাল কিসের?'

সবাই তাকেই সালিস মানল:

'তুমি ভালুক, বনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে বুদ্ধিমান। ন্যায়মতে বিচার করো। যার পক্ষে রায় দেবে, সেই পাবে।'

সব কথা বললে তারা ভালুককে।

ভালুক ভেবে ভেবে কান চুলকোলে। বললে:

'কে প্রথম দেখেছিল?'
খরগোস বললে, 'আমি!'

'আর কে পাড়ল?'
'আমি,' বলে কা-কা করলে কাক।

'বেশ, কিন্তু কে কুড়ল?'
'আমি!' বললে সজারু।

ভালুক রায় দিলে, 'সবাইকারই অধিকার আছে তাহলে, প্রত্যেকেরই পাওনা আছে।'

'কিন্তু আপেল যে একটা,' বললে খরগোস, সজারু, দাঁড়কাক।

'সমান সমান তিন ভাগ করো, এক একজনে নেবে এক এক ভাগ।'

সবাই সমস্বরে বলে উঠল:

'সত্যিই তো, কথাটা মনেই হয় নি।'

আপেলটা নিয়ে চার ভাগ করলে সজারু।

এক ভাগ দিলে খরগোসকে:

‘এটা তোর জন্যে, তুই প্রথম দেখেছিলি।’

দ্বিতীয় ভাগটা দিলে দাঁড়কাককে:

‘এটা তোর জন্যে কাক, তুই পেড়েছিলি।’

তৃতীয় ভাগটা সজারু নিজের মুখে পুরলে:

‘এটা আমায়, আমি কুড়িয়েছিলাম।’

চতুর্থ ভাগটা সজারু ভালুকের থাবায় রাখলে:

‘এটা তোমার জন্যে ভালুক...’

‘আমায় কেন?’ অবাক হল ভালুক।

‘কারণ ঝগড়া মিটিয়ে দিলে তুমি, বুদ্ধি দিলে ভালো।’

সবাই যে যার ভাগ খেলে আনন্দ করে, কেননা ন্যায্যমতো বিচার করেছে ভালুক, কাউকে ঠকায় নি।
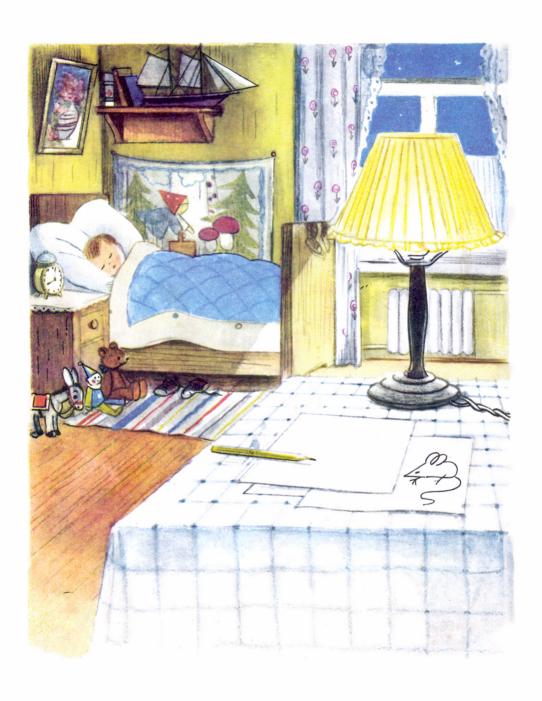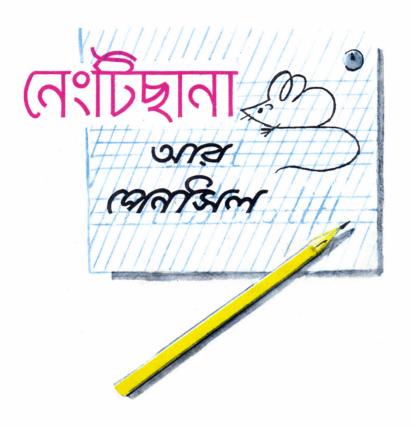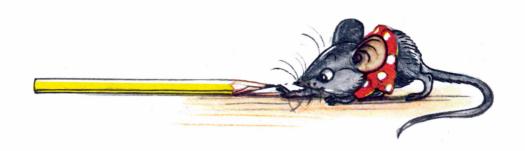
নেংটিছানা
আর
পেনসিল

এক যে ছিল পেনসিল। ভোভার পেনসিল।

একদিন ভোভা ঘুমুচ্ছে, এমন সময় টেবলে উঠে এল এক নেংটিছানা। দেখে কি, পেনসিল। দেখেই পেনসিলটাকে টেনে এনে হাজির একেবারে গর্তে।

পেনসিল বলে, ‘দোহাই তোর, ছেড়ে দে! আমায় নিয়ে কী করবি? আমি যে কাঠ, খাবার তো নই।’

নেংটি বলে, 'না খাই, চিবুব। দাঁত শুড়শুড় করছে আমার, সারাক্ষণ কিছু একটা আমায় চিবুতেই হবে, এ্যাই!' বলেই সে কষে কামড় বসালে পেনসিলে।

'মা গো!' বললে পেনসিল, 'তবে দে, শেষ বারের মতো কিছু একটা আঁকি। তারপর যা ইচ্ছে করিস।'

'বেশ,' রাজী হল নেংটি, 'আঁকতে চাস, আঁক। তারপরে কিন্তু তোকে চিবিয়ে কুটিকুটি করব।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পেনসিল আঁকলে একটা গোল রেখা।
'পনীর বুঝি?' জিজ্ঞেস করলে নেংটি।
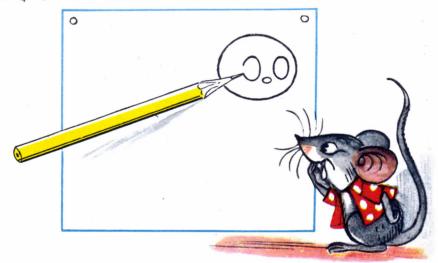
'পনীরই হয়ত,' এই বলে পেনসিল তার মধ্যে আঁকলে আরো ছোটো ছোটো তিনটে গোল।
'নিশ্চয় পনীর, এগুলো তার গায়ের ফুটো,' ঠিক বুঝে নিলে নেংটি।
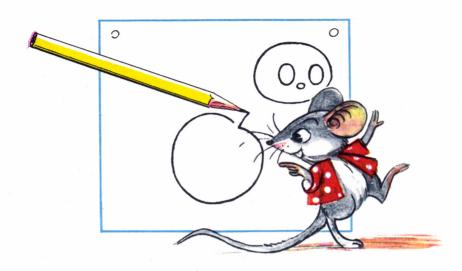
‘ফুটোই হয়ত,’ এই বলে পেনসিল আঁকলে আরো একটা মস্ত গোল।
‘এটা নিশ্চয় আপেল!’ চেঁচিয়ে উঠল নেংটি।
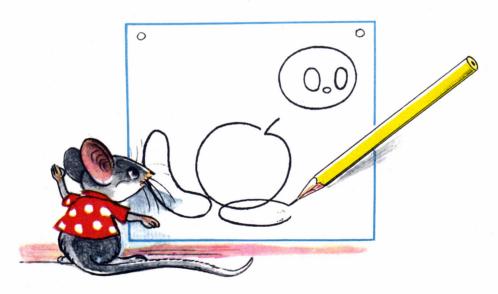
‘আপেলই বোধ হয়,’ এই বলে পেনসিল আঁকলে এই রকমের কয়েকটা লম্বাটে জিনিস।
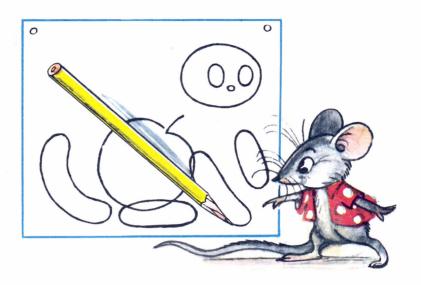
'জানি, জানি! এতো সসেজ!' ঠোঁট চেটে চেঁচাল নেংটি, 'নে বাপু, শিগগির শেষ কর। ভারি শুড়শুড় করছে দাঁত।'
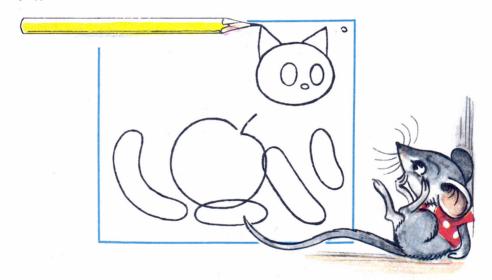
পেনসিল বললে, 'একটু দাঁড়া।' তারপর যেই না এই তেকোণগুলো এঁকেছে, অমনি চেঁচিয়ে উঠল নেংটি:

'এ যে দেখি অনেকটা সেই বে ... থাম, থাম, আর আঁকিস না!'
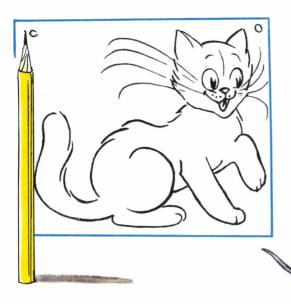
পেনসিল কিন্তু ততক্ষণে এঁকে শেষ করেছে লম্বা লম্বা গোঁপ…

'সত্যিই একেবারে বেড়াল!' ভয় পেয়ে কিচকিচ করে উঠল নেংটি। 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে সেঁধল একেবারে গর্তের মধ্যে।

তারপর থেকে নেংটি ইঁদুরের নাকটিও আর দেখা যায় নি।

পেনসিল কিন্তু এখনো সেই রয়ে গেছে ভোভার কাছেই। কেবল একটু যেন ছোটো হয়ে এসেছে।

নেংটিকে ভয় দেখাবার মতো এমনি ধারা বেড়াল আঁকতে পারো কি? দেখো না চেষ্টা করে।

মোরগ
আর
রঙ
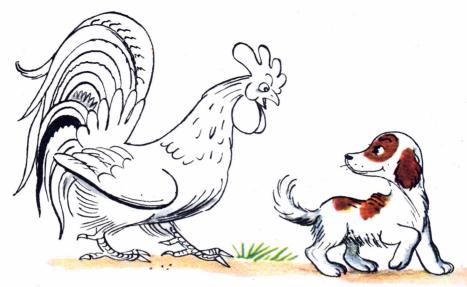
মোরগ আঁকলে ভোভা। কিন্তু রঙ দিতে ভুলে গেল।
বেড়াতে বেরিয়েছে মোরগ।
কুকুর দেখে অবাক, 'অমন কুরূপ হয়ে ঘুরছিস যে?'

জলে নিজের রূপ দেখলে মোরগ। সত্যি — কুকুর ঠিকই বলেছে।

‘দুঃখ করিস না,’ বললে কুকুর, ‘রঙদের কাছে যা, তোকে সজিয়ে দেবে।’

রঙের কাছে গেল, মিনতি করলে:
‘রঙ, ও রঙ, আমায় সাজিয়ে দাও!’
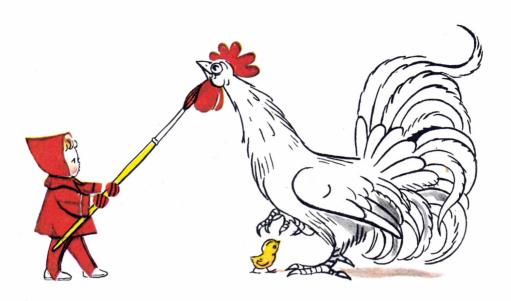
'তা বেশ,' এই বলে লাল রঙ তার ঝুঁটি দাড়ি রাঙিয়ে দিলে।

নীল রঙ রাঙালে তার লেজের পালক।

সবুজ রঙ দিয়ে ডানা।
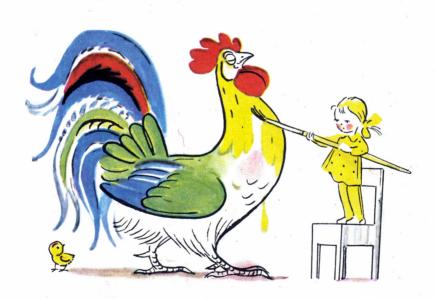
হলুদ দিয়ে বুক।

‘এবার তুই সত্যিকারের মোরগ!’ বললে কুকুর।

আর এই মোরগটিকে তুমি নিজেই রঙ দিয়ে দেখো তো। বাচ্চাকেও ভুলো না, রঙ তার হলদে।

খামখেয়ালী
বেড়াল
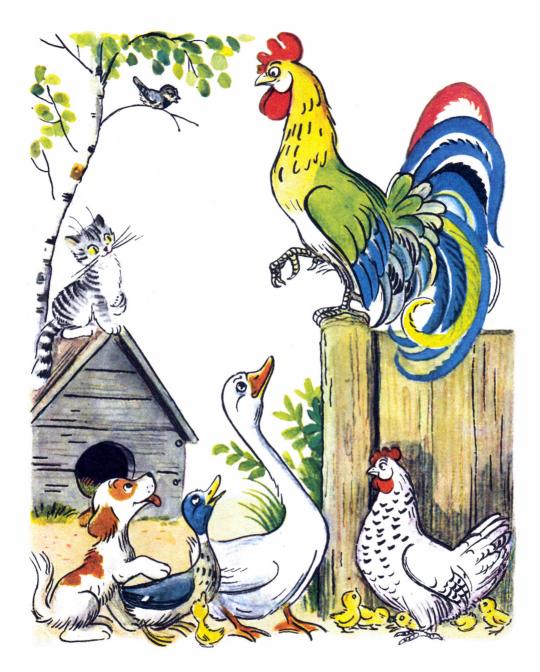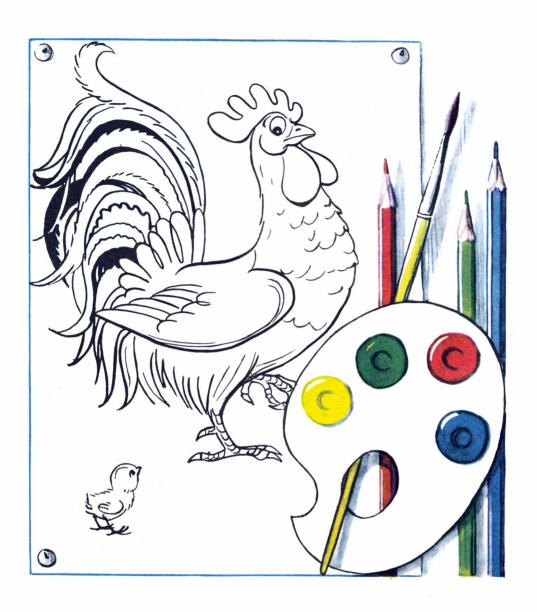
খুকুমণি টেবলে বসে ছবি আঁকছিল।
হঠাৎ এল ডোরাকাটা বেড়াল, দেখতে লাগল কি করছে খুকুমণি।
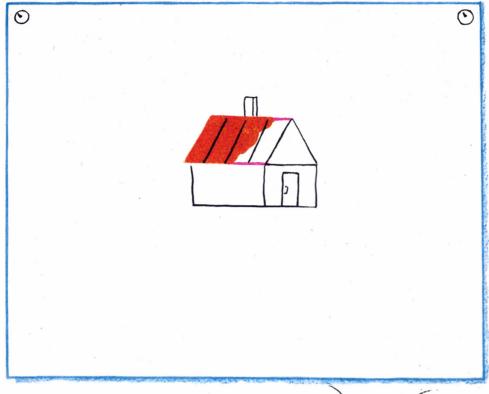
'এটা কি করছ তুমি?' জানতে চাইলে কৌতূহলী বেড়াল।

'তোর জন্যে বাড়ি আঁকছি,' বললে খুকুমণি। 'দ্যাখ, কেমন চালা, কেমন তাতে চিমনি, আর এটা দরজা...'

'ও বাড়িতে আমি করব কি?'

'উনুন ধরিয়ে জাউ রাঁধবি।'

খুকুমণি এঁকে দিলে কেমন করে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে।

'কিন্তু জানলা কোথায়? বেড়ালরা তো জানলা দিয়েই ঘরে ঢোকে।'
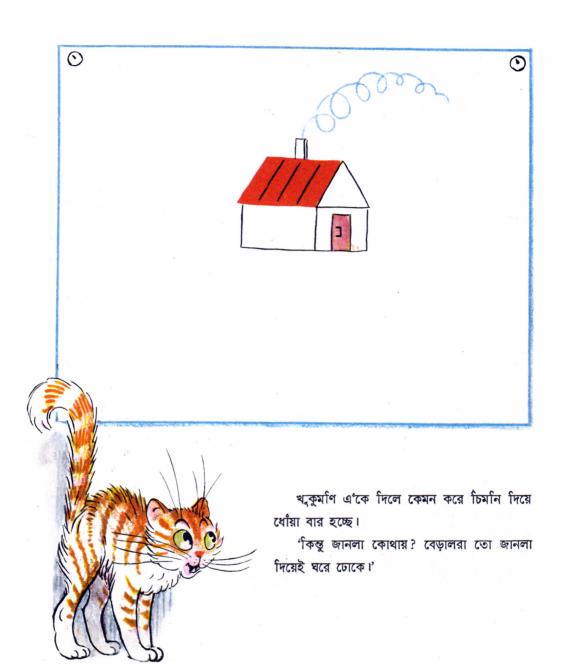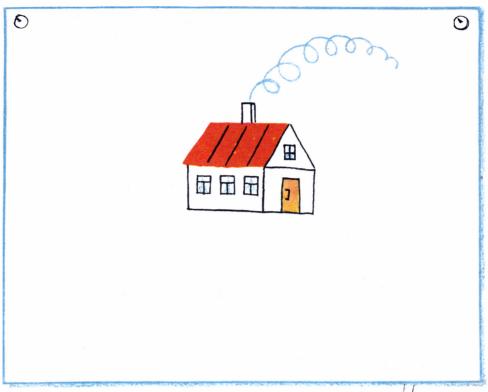
‘এই নে তোর জানলা। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে …’ বলে খুকুমণি চারটে জানলা এ‘কে দিলে।

‘বেড়াব কোথায়?’

'এই যে এখানে।'

খুকুমণি এঁকে দিলে বাড়ির চারিধারে বেড়া।

বললে, 'এটা হবে বাগান।'

বেড়াল দেখে ফ্যাঁচ করে উঠল:

'এটা আবার বাগান কিসের? কিছুই যে নেই এখানে!..'
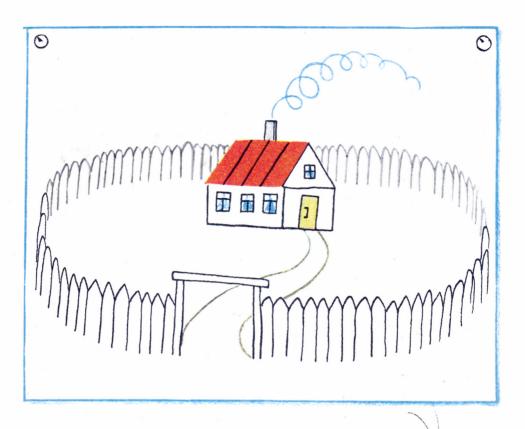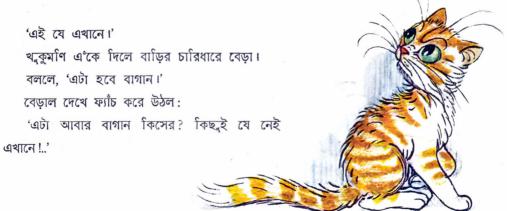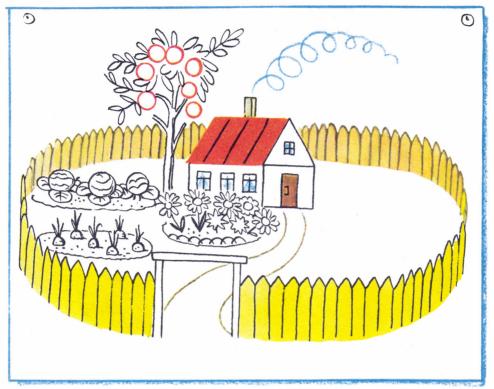
'দাঁড়া একটু,' বললে খুকুমণি, 'এই তোর ফুলের কেয়ারি, এই তোর আপেল গাছে ফল ফলেছে, এইখানে তোর তরকারি ক্ষেত: গাজর ফলছে, বাঁধাকপি ফলছে ...'

'বাঁধাকপি!' মুখ বেঁকিয়ে বললে বেড়াল, 'মাছ ধরব কোথায়?'

‘এইখানে ...’

খুকুমণি আঁকলে পুকুর, আর পুকুরে মাছ।

‘তা বেশ ... তবে পাখি থাকবে তো?’ জানতে চাইলে কৌতূহলী বেড়াল, ‘আমি ভালোবাসি পাখি।’
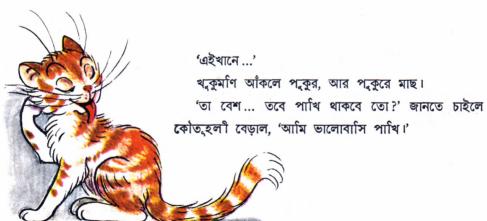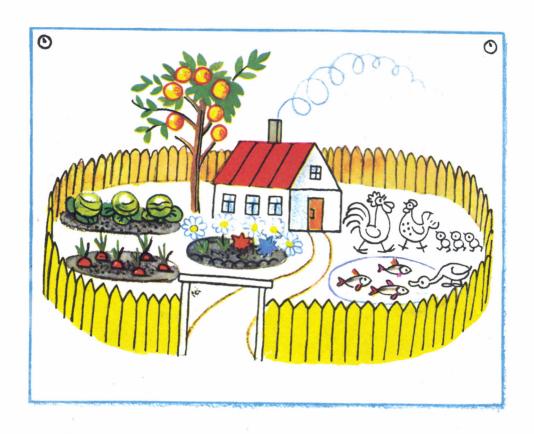
'থাকবে। এই নে তোর মুরগী, মোরগ, হাঁস, আর এই দ্যাখ, তিনটে মোরগছানা...'

হঠাৎ বেড়াল ঠোঁট চাটলে, গর্‌গর্‌ করলে, খুব চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে:

'আচ্ছা, বাড়িটায় নেংটি ইঁদুর থাকবে তো...?'

'না, নেংটি ইঁদুর থাকবে না।'

'তাহলে আমার বাড়ি চৌকি দেবে কে?'

'হচ্ছে চৌকিদারির ব্যবস্থা...' খুকুমণি আঁকলে একটা কুকুরের ঘর, 'এই হবে তোর চৌকিদার... ববিক।'

দেখে বেড়াল লেজ নড়ালে, গায়ের রোঁয়া উঠল খাড়া হয়ে।

‘ও বাড়ি আমার একটুও পছন্দ নয়,’ বললে বেড়াল, ‘চাই নে এখানে থাকতে!..’
এই বলে সে চলে গেল মুখ ভার করে।
দ্যাখ কেমন খামখেয়ালী বেড়াল!

ফার গাছ

ছেলেমেয়েরা ক্যালেণ্ডার দেখলে; কেবল শেষ পাতাটা বাকি।
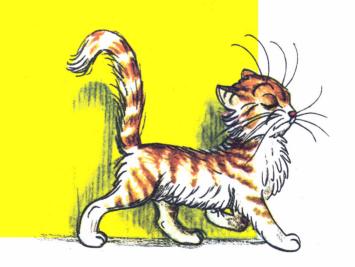
তার মানে কাল নববর্ষ। কাল ফার গাছ সাজিয়ে উৎসব। তার সাজসজ্জা সবই তৈরি, কিন্তু গাছটি যে নেই। ছেলেমেয়েরা ঠিক করলে চিঠি পাঠাবে শীত দাদুর কাছে, বিজিবিজি বন থেকে ফার গাছ যেন পাঠায় — সবচেয়ে ঝুমঝুমিটি, সবচেয়ে সুন্দরটি।

শীত দাদু, শীত দাদু,
নতুন বছরের জন্য
ফার গাছ পাঠিয়ো আমাদের।
সাজাব তোমার
আমরাই।
চিঠি তোমায় পৌঁছে দেবে
এই বরফ পুতুলটি।

ছেলেমেয়েরা

এই চিঠি লিখে ছেলেমেয়েরা আঙিনায় দৌড়ে গেল বরফ পুতুল বানাতে।

মিলেমিশে কাজ শুরু হয়ে গেল: কেউ বরফ জোগাড় করে, কেউ গোলা পাকায়...

বরফ পুতুলের মাথায় পরানো হল পুরনো বালতি, চোখ বানালে কয়লা দিয়ে, আর নাকের জায়গায় গুঁজে দিলে লাল গাজর।

বেশ হল ডাক-হরকরা বরফ পুতুল।

চিঠি তাকে দিয়ে ছেলেমেয়েরা বললে:

'বরফ পুতুল, বরফ পুতুল
ডাক-হরকরা গা তুলতুল,
যা চলে যা গহন বনে
পত্রটা দিস যথাস্থানে।

শীত দাদুকে দিবি তাড়া,
বেছে দেবে ফারের চারা,
সবুজ পাতার ঝালর ঘেরা,
বনের মধ্যে সবার সেরা।

ফার গাছটি আনিস বয়ে
ধন্যি দেবে ছেলেমেয়ে।'
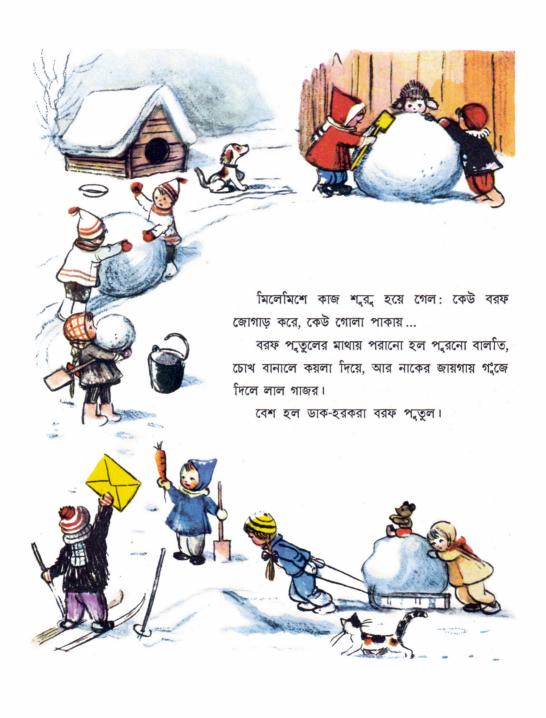
সন্ধে হল, ঘরে চলে গেল ছেলেমেয়েরা। বরফ পুতুল মনে মনে ভাবে: কাজ তো চাপিয়ে গেল, কিন্তু যাই কোথায়?

'আমায় সঙ্গে নে,' হঠাৎ বললে কুকুরছানা ববিক, 'আমি রাস্তা দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক বলেছিস, দুয়ে মিলে যাই, ভয় ভাবনা নাই!' খুশি হল বরফ পুতুল, 'শত্রু তাড়াবি, পথ দেখাবি।'

বরফ পুতুল আর ববিক যায় যায়, যেতে যেতে পৌঁছল এক মস্ত বড়ো গহীন বনে...

সামনে দেখে এক খরগোস।

'বল তো, শীত দাদু এখানে থাকে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে বরফ পুতুল।

কিন্তু জবাব দেবার সময় কোথায় খরগোসের, পেছনে তার তাড়া করেছে শেয়াল।

আর ববিকও 'ঘোঁৎঘোঁৎ' করে ছুটল খরগোসের পেছনে।

মন খারাপ হয়ে গেল বরফ পুতুলের।

'দেখছি এবার একা একাই যেতে হবে।'

এমন সময় ফুঁসে উঠল বরফ ঝড়, পাক দিয়ে ঝাপটা মারে কেবলি...

থরথরিয়ে কেঁপে উঠল বরফ পুতুল... সব বরফ তার খসে খসে পড়ল। পড়ে রইল শুধু বালতিটা, চিঠিটা, আর গাজরটা।

শেয়াল ফিরে এল একেবারে রেগে কাঁই:
'শিকারে আমায় বাধা দিয়েছিল কে?'
দেখে কেউ নেই, শুধু বরফের ওপর পড়ে আছে চিঠিটা। চিঠিটা নিয়ে পালাল সে।

ফিরল ববিক:

'কোথায় গেল বরফ পুতুল?'

নেই সে।

এই সময় শেয়ালের সঙ্গ ধরল নেকড়ে।

'কী নিয়ে চলেছিস র‍্যা?' গর্জন করলে নেকড়ে, 'ভাগ দে শিগগির!'

'আমি পেয়েছি, আমার! ভাগ নেই তোমার,' বলেই পালাল শেয়াল।

তার পেছনে নেকড়ে।
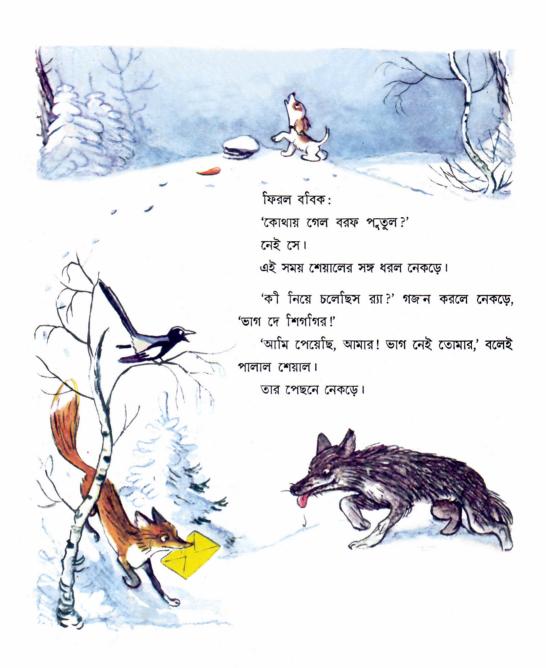
কী হচ্ছে দেখি বলে হাঁড়িচাঁচাও উড়ল পেছন পেছন।

ববিক কাঁদে, আর খরগোসরা বলে:
'ঠিকই হয়েছে তোর, কেন তাড়া করিস আমাদের, কেন ভয় দেখাস?'

'ভয় দেখাব না, তাড়া করব না,' বলে ববিক আরো জোরে কেঁদে উঠল।

'কাঁদিস না, আমরা তোকে সাহায্য করব,' বললে খরগোসরা।
'আর খরগোসদের সাহায্য করব আমরা,' বললে কাঠবেড়ালিরা।

বরফ পুতুল তৈরি করতে লাগল খরগোসরা, কাঠবেড়ালিরা সাহায্য করে তাদের. ছোটো ছোটো থাবা দিয়ে থাবড়ায়, লেজ দিয়ে মোছে।

ফের তার মাথায় উঠল বালতি, চোখে জ্বলল কয়লা, আর নাকের জায়গায় গাজরটি।

'ধন্যি তোরা,' বললে বরফ পুতুল, 'আমায় ফের গড়ে তুললি, এবার শীত দাদুকে খুঁজে দে।'

তাকে তারা নিয়ে গেল ভালুকের কাছে। গুহার মধ্যে ঘুমিয়েছিল ভালুক, বহু কষ্টে জাগানো হল তাকে।

ছেলেরা তাকে শীত দাদুর কাছে চিঠি দিতে পাঠিয়েছে সে সব কথা তাকে বললে বরফ পুতুল।

'চিঠি?' গর্জন করে উঠল ভালুক, 'কোথায় চিঠি?'

হাতড়িয়ে দেখে চিঠি নেই।

'চিঠি ছাড়া ফার গাছ দেবে না শীত দাদু,' বললে ভালুক 'ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে যাও, আমি বন পর্যন্ত পেঁাছে দেব।'

হঠাৎ, কোথা থেকে যেন উড়ে এল হাঁড়িচাঁচা, কিচিরমিচির করে বলে:

'এই নাও চিঠি!'

বললে কী করে সে চিঠি পেলে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই ...

চিঠি নিয়ে সবাই গেল শীত দাদুর কাছে।

বরফ পুতুলের ভারি তাড়া, কখনো গড়িয়ে পড়ে ঢিবি থেকে কখনো উলটে পড়ে খানাখন্দে, কখনো হোঁচট খায় গাছের গুঁড়িতে।

ভাগ্যি ভালো ভালুক তাকে বাঁচায়, নয় তো ফের আবার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছল শীত দাদুর কাছে।

চিঠি পড়ে শীত দাদু বললে:

'এত দেরি হল যে? সময়মতো ফার গাছ নিয়ে তো তুই পৌঁছতে পারবি না।'
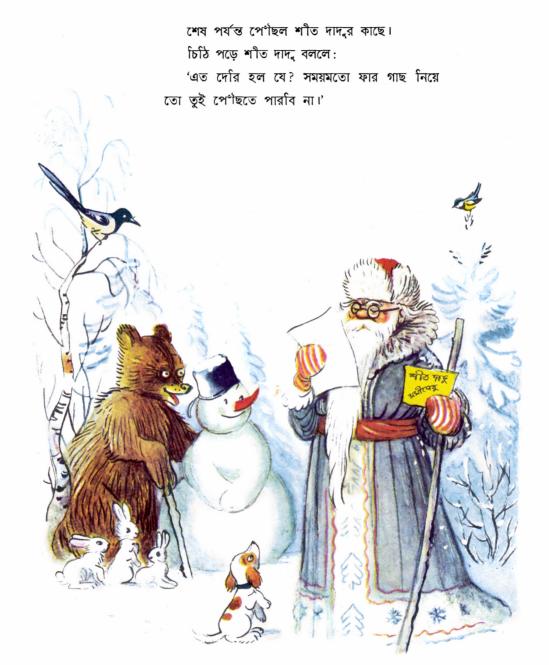
সবাই তখন বরফ পুতুলের পক্ষ নিলে, বললে কী হয়েছিল। শীত দাদু তখন তার নিজের স্লেজগাড়িটা দিয়ে দিলে তাকে, বরফ পুতুলও ফার গাছ নিয়ে ফিরে চলল ছেলেমেয়েদের কাছে।

ভালুকও ফিরল তার গুহায় — বসন্ত পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবে।
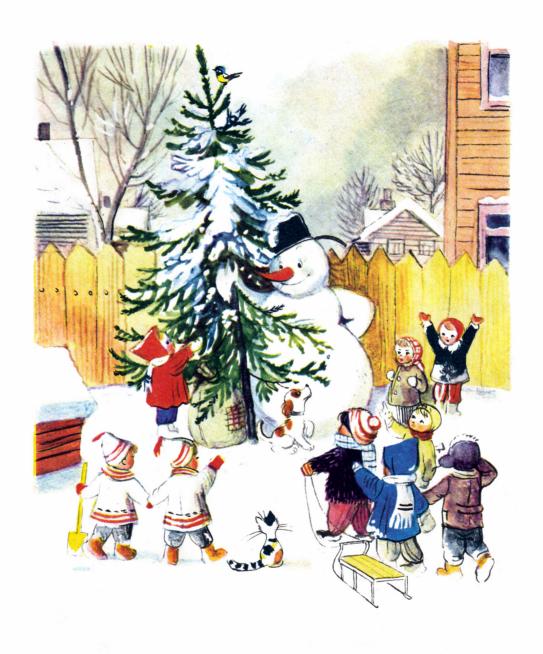
আর সকালবেলায় দেখা গেল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বরফ পুতুল। হাতে তার চিঠির বদলে ফার গাছ।

এ
আবার
কোন
পাখি ?

এক যে ছিল হাঁস।
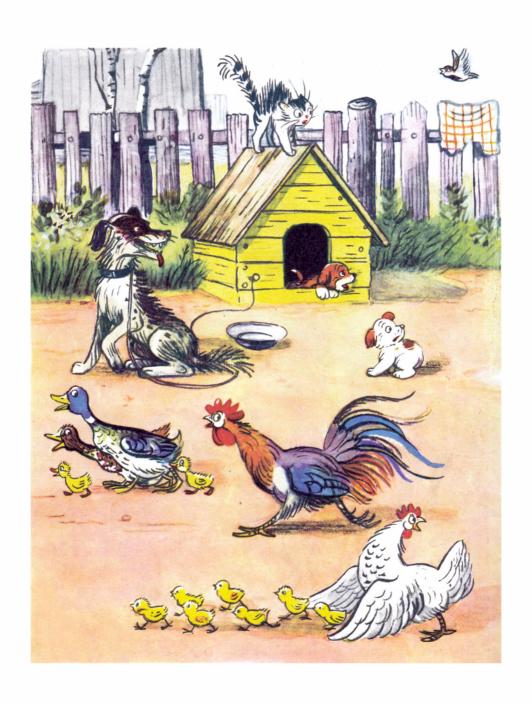
ভারি বোকা, ভারি হিংসুটে।

সব হাঁসকেই তার হিংসে, সবার সঙ্গেই তার ঝগড়া, সব নিয়েই তার গুজুর গুজুর ... সবাই মাথা নেড়ে বলত:

'আচ্ছা লোক বটে!..'

একবার পুকুরে রাজহাঁসের সঙ্গে দেখা।

তার লম্বা গলাটা দেখে ভারি ভালো লাগল তার।

ভাবলে, অমন গলা যদি আমার হত!

রাজহাঁসকে মিনতি করলে:

'এসো বদল করি, আমার গলাটা তুমি নাও, তোমারটা আমি।'

ভেবে চিন্তে রাজী হল রাজহাঁস।

বদল করে নিলে।
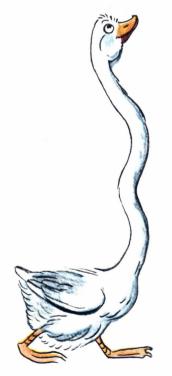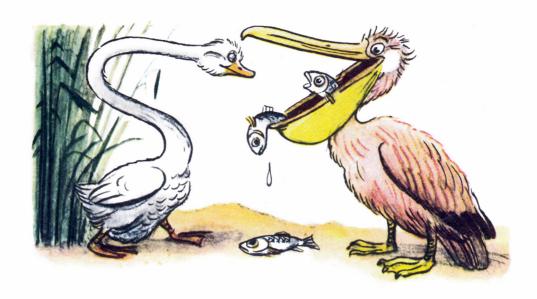
হাঁস চলেছে এক লম্বা গলা বাড়িয়ে, ভেবে পাচ্ছে না কি করবে তা দিয়ে। কখনো বা এদিকে ফেরায়, কখনো বা লম্বা করে দেয়, কখনো বা গোল করে বাঁকায় — কিছুতেই সুবিধে হয় না।

তাঁকে দেখে হাসতে লাগল পেলিকান পাখি।

বলে, 'তুই হাঁসও নস, রাজহাঁসও নস! হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ!'

রাগ হয়ে গেল হাঁসের, ভাবলে হিসিয়ে উঠবে, হঠাৎ চোখে পড়ল পেলিকানের ঠোঁটের সঙ্গে মস্ত বড়ো থলি।

ভাবলে, অই রকম থলি-ঝোলানো ঠোঁট হলে বেশ হত।

পেলিকানকে বলে:

'এসো বদল করি, তুমি নাও আমার লালচে ঠোঁট, আমি নিই তোমার থলি-ঝোলানো ঠোঁট।'

হাসি পেল পেলিকানের, তাহলেও রাজী হল।

বদল করে নিলে।
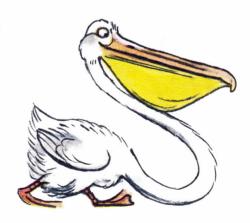
বদল করতে ভারি ভালো লেগে গেল হাঁসের।

সারসের সঙ্গে পা বদল করে নিলে। নিজের থ্যাবড়া পা দিয়ে নিলে সরু সরু লম্বাটে ঠ্যাঙ।

নিজের শাদা শাদা বড়ো সড়ো ডানার বদলে নিলে দাঁড়কাকের ছোটো খাটো কালো পাখা।

অনেক বলে কয়ে ভজালে ময়ূরকে, নিজের
ছোট্ট পুচ্ছটির বদলে নিলে তার ঝলমলে পেখম।

ভালোমানুষ মোরগ তার ঝুঁটি দাড়ি সেই
সঙ্গে 'কোঁকর-কোঁ' ডাকটাও দান করলে হাঁসকে।
একেবারে অন্যরকম চেহারা হল হাঁসের।
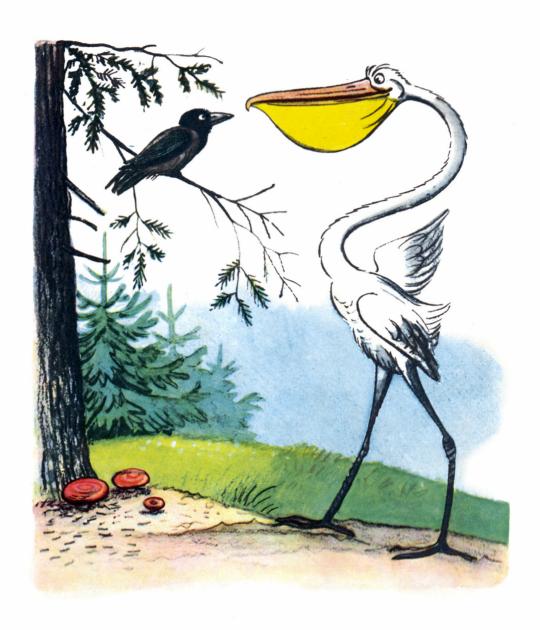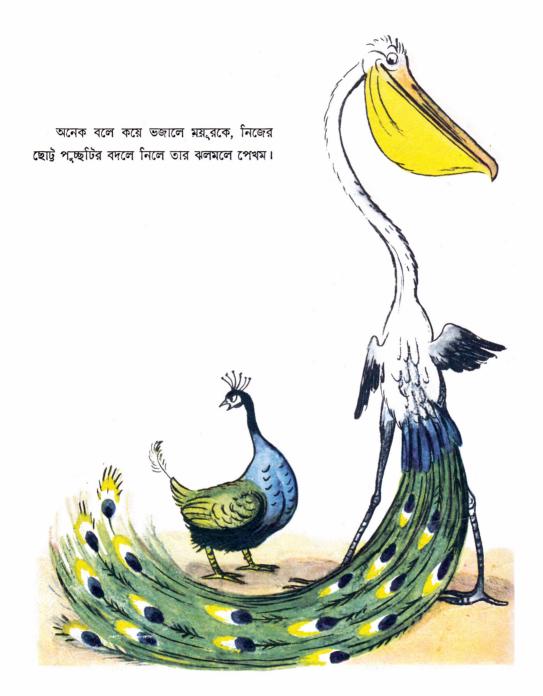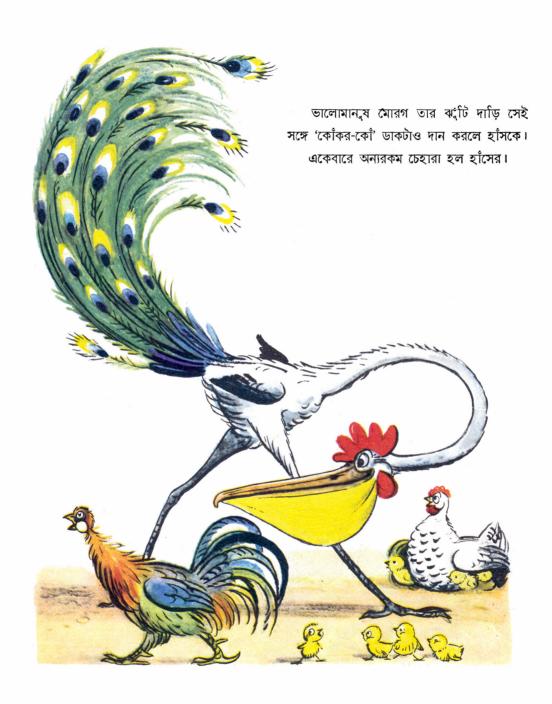
হাঁস চলেছে সারসের ঠ্যাঙ তুলে, দোলাচ্ছে তার কাকের ডানা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঁকাচ্ছে তার রাজহাঁসের গলা।

দেখা হল একপাল হাঁসের সঙ্গে।

'প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক! এ আবার কোন পাখি?' অবাক হল হাঁসেরা।

'আমি হাঁস!' চেঁচিয়ে বললে পাখি, ঝাপট মারলে তার কাকের ডানায়, টান করে দিলে তার রাজহাঁসের গ্রীবা, গলা খাঁকারি দিলে তার পেলিকানের গলায়:

'কোঁকর-কোঁ! কোঁকর-কো! সবচেয়ে আমি সুন্দর!'

'হাঁস যদি হ'স তবে চল আমাদের সঙ্গে,' বললে হাঁসেরা।

ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ল সবাই, সেই সঙ্গে আমাদের হাঁস।

সবাই ঘাসের মধ্যে খুঁটে খুঁটে খায়, থলি-ঝোলানো ঠোঁট নিয়ে হাঁসের কিন্তু হয়রানিই সার — খেতে আর পারে না।

পুকুরে সাঁতার দিতে নামল সবাই, সেই সঙ্গে আমাদেরটিও।

সবাই জলে ভাসে, হাঁসের কিন্তু তীরেই ছোটাছুটি সার — সারসের পা দিয়ে তো আর সাঁতার দেওয়া যায় না।

সবাই হাসাহাসি করে:

'প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক!'

আর ও জবাব দেয়:

'কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ!'

তীরে এসেছে হাঁসেরা, হঠাৎ কোথা থেকে যেন হাজির এক শেয়াল।

প্যাঁক প্যাঁক করে উড়ে গেল হাঁসেরা।

পড়ে রইল কেবল আমাদের হাঁসটি — কাকের ডানায় তার ভারি শরীর ওড়ে না। সারসের ঠ্যাঙ নিয়েই তখন সে ছুটতে গেল, কিন্তু ঝোপে ঝাড়ে জড়িয়ে গেল ময়ূরের লেজে...

তখন তার লম্বা রাজহাঁসের গ্রীবায় কামড়ে ধরে নিয়ে চলল শেয়াল...

তা দেখে উড়ে এল হাঁসের পাল, চারিদিক থেকে ঠোকর মারতে লাগল শেয়ালকে।

শিকার ছেড়ে ছুটে পালাল শেয়াল।

হাঁস বললে, 'বাঁচালি ভাই তোরা আমায়। এবার আমার চৈতন্য হয়েছে।'

রাজহাঁসের কাছে গেল হাঁস, ফেরত দিলে তার লম্বা গলা, পেলিকানকে দিলে তার থলিওয়ালা ঠোঁট, সারসকে তার সরু সরু ঠ্যাঙ, দাঁড়কাককে তার কালো ডানা আর ময়ূরকে দিলে তার ঝলমলে পেখম।

আর ভালোমানুষ মোরগকে দিলে তার ঝুঁটি দাড়ি, সেই সঙ্গে 'কোঁকর-কোঁ' ডাক।

ফের হাঁস হয়ে গেল সে।

তবে এখন তার কান্ডজ্ঞান বেশি, হিংসে কম।

এই হল আমাদের হাঁসের গল্প।

আমার কথাটি ফুরুল।

সূচি